হুমায়ূন আহমেদ

অসময়ে চলে গেছেন এ সময়ের জনপ্রিয়তম কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ (১৩ নভেম্বর ১৯৪৮—১৯ জুলাই ২০১২)। লেখক, প্রকাশক ও তাঁর অগণিত অনুরাগী বেদনাহত। হুমায়ূন আহমেদকে লেখা তাঁর বড় ছেলে নুহাশ হুমায়ূনের একটি চিঠি, বোন মমতাজ শহীদের স্মৃতিচারণা এবং হুমায়ূন আহমেদের অপ্রকাশিত একটি রচনা দিয়ে সাজানো হলো এই বিনীত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

AMARBOI.COM

আলোকচিত্র : নাসির আলী মামুন

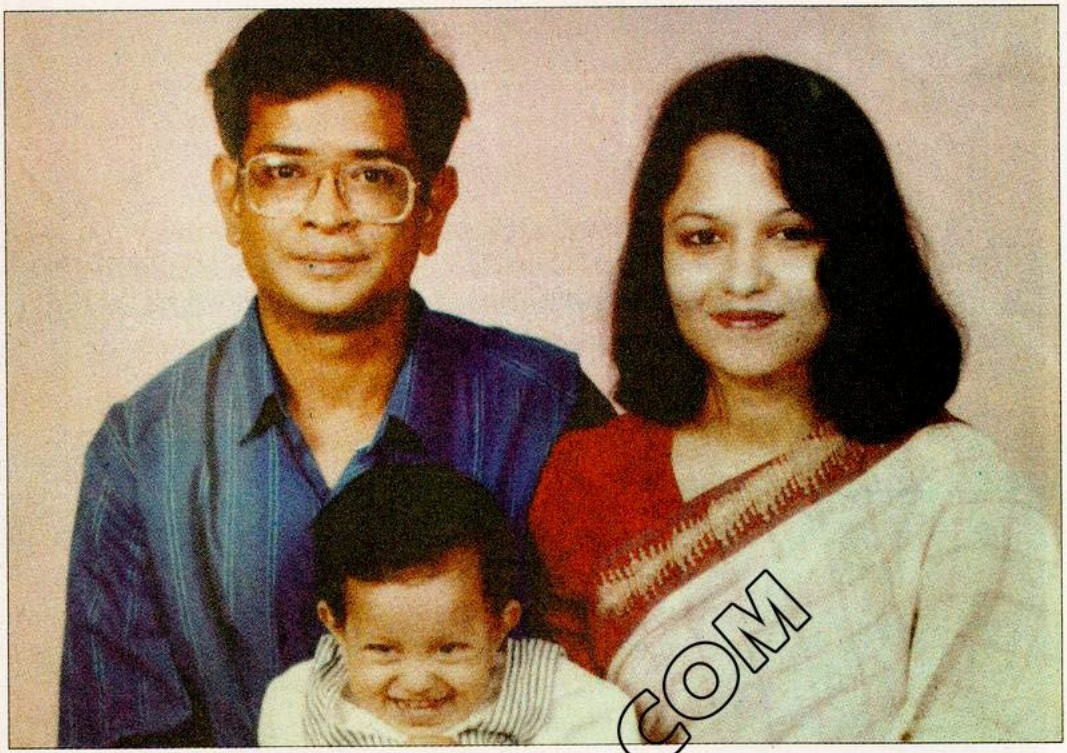

হুমায়ূন আহমেদ, গুলতেকিন খান ও তাঁদের ছেলে নুহাশ হুমায়ূন

বাবার কাছে

নুহাশ হুমায়ূন

বাবার প্রথম অপারেশানের কিছুদিন পরে, জুলাই মাসে তাঁকে আমি একটি চিঠি লিখি। চাচা-চাচী যখন নিউইয়র্কে বাবার কাছে ছিলেন, সে সময় তাদের কাছে আমি চিঠিটা ই-মেইল করে দেওয়ার কথা ভেবেছিলাম। আমি চেয়েছিলাম, বাবার জ্ঞান ফিরে এলে তাঁরা চিঠিটি তাঁকে পড়ে শোনাবেন। কিন্তু সেটি আর হয়নি। মৃত্যুর আগে তাঁর জ্ঞান আর কখনোই পুরোপুরি ফিরে আসেনি। এই চিঠিটি তাঁকে পড়ে শোনার সুযোগ হলো না বলে আমার ভেতরে আমি একটি গভীর শূন্যতা অনুভব করি। চিঠিটি খুবই ব্যক্তিগত; কিন্তু আমার মনে হয়, যদি অন্যেরাও এই চিঠিটি পড়েন, হয়তো, নিছকই হয়তো, আমার সেই শূন্যতা কিছুটা দূর হবে।

AMARBOI.COM

বাবা,

আশা করি ভালো আছ। আমি নিজে খুব ভালো অবস্থায় নেই। আমার টাইফয়েড হয়েছে। টাইফয়েডের জন্য পেটটা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। পুরো একটা সপ্তাহ ধরে শুধু চালের এক জঘন্য অরুচিকর জিনিস ছাড়া আর কিছুই খাইনি; বাংলায় যাকে সম্ভবত বলে 'জাউ'। বিছানায় পড়ে থেকেছি, শুধু জাউ খেয়েছি; আর কল্পনায় ভেবেছি, কবে সেরে উঠব, কবে সুস্বাদু খাবারগুলো খেতে পাব। একটা সময়ে তো গলদা চিংড়ির জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, আর আমার মনে পড়ে গিয়েছিল অন্য কিছু।

যখন মায়ের সঙ্গে তোমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, আমার ভীষণ কষ্ট হয়েছিল। কারণ, আমার সব সময়ই মনে হতো, সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে, তুমি আবার আমাদের কাছে ফিরে আসবে। কিন্তু যখন তোমাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেল, তখন আমি উপলব্ধি করলাম সেই দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রসায়নের ভাষায় আমি প্রত্যক্ষ করলাম একটা দহন, পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়া। এক অনিবর্তনীয় প্রক্রিয়া।

আমার সবচেয়ে বড় ভয় ছিল, আমি তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাব, তুমিও আর আমাকে তোমার ছেলের মতো করে দেখবে না। বিবাহবিচ্ছেদের কয়েক দিন পরে তুমি আমাকে ফোন করলে। বললে, বিশাল সব গলদা চিংড়ি নিয়ে এইমাত্র তুমি বাজার থেকে এসেছ। বললে, তুমি ওগুলো রান্না করতে চাও, তোমার বাসায় আমার সঙ্গে বসে খেতে চাও। তুমি-আমি দুজনেই জানতাম, এটা সম্ভব হবে না। ঠান্ডা যুদ্ধের সময় ঘটা করে ভোজ করা যায় না। কিন্তু ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হলো না। প্রায় আধঘণ্টা পরে ইন্টারকম বাজতে শুরু করল। গার্ড আমাকে জানাল, গেটের বাইরে আমার বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে একটা জ্যান্ত গলদা চিংড়ি। প্রথমে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। তারপর মজা লাগল। খানিক উত্তেজনা নিয়ে নিচে নেমে গেলাম। তুমি বললে, 'বাবা, আমি খুব চাচ্ছিলাম এটা আমরা এক সঙ্গে খাই। কিন্তু সেটা তো এখন সম্ভব না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, সব সময় আমি তোমার পাশে থাকব। একদিন আমরা আবার এক সঙ্গে বসে ভালো খাবার খাব। কিন্তু আপাতত আমি চাই তুমি এটা খাও।' তারপর তুমি আমার হাতে তুলে দিলে একটা জ্যান্ত গলদা চিংড়ি। পানির ফোঁটার মতো চোখ আর সরু সরু ঠ্যাংওয়ালা ওই সাংঘাতিক জীবটাকে আমার মনে হচ্ছিল আশা। এই আশা যে, যা-কিছুই ঘটুক না কেন, তুমি সব সময়ই আমার পাশে থাকার চেষ্টা করবে।

আমার মনে হয় না আমি তোমার

গুলতেকিন খান, হুমায়ূন আহমেদের বোন শেফু, মা আয়েশা ফয়েজ এবং নোভা, শীলা, বিপাশা, শর্মি ও আমি

AMARBOI.COM

পাশে ছিলাম, অন্তত তত পরিমাণে নয়, যতটা আমার থাকা উচিত ছিল। যখন তোমাকে আমি ফোন করতাম, প্রায়ই তুমি কথা বলার মতো অবস্থায় থাকতে না। আর যখন আমাদের কথা হতো, আমার এত খারাপ লাগত যে ভালো করে নিজেকে প্রকাশ করতে পারতাম না। আমি কখনোই তোমার মতো শক্তের কারিগর ছিলাম না। অস্ত্রোপচারের আগে তুমি যখন ঢাকায় ফিরে এলে, তখন তোমাকে দেখতে যাওয়া কষ্টকর ছিল। তোমার বাসায় যেতে প্রত্যেকবার গেটে বাধা পাওয়া ছিল বেদনাদায়ক। বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কোনো ছেলেরই প্রত্যেকবার নিরাপত্তাপ্রহরীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কথা নয়। কিন্তু এগুলো কোনো অজুহাতই নয়। তোমার কাছে আমার আরও বেশি বেশি যাওয়া উচিত ছিল। আমি চাই, সবকিছু বদলে যাক। আমি তোমাকে জানাতে চাই, আমি তোমাকে অসম্ভব মিস করি। তুমি জেনো, আমি যতটা তোমাকে আমার পাশে পেতে চাই, ততটা পাই না বলে আমার ভেতরটা এখনও পোড়ায়।

এই চিঠি তোমার জন্য আমার গলদা চিংড়ি।

তোমার ছেলে
নুহাশ

ইংরেজি থেকে অনূদিত

দাদাভাই

মমতাজ শহীদ

৯৫+৫ = ১০০

আমরা ছয় ভাইবোন। আম্মার সবচেয়ে বেশি আদর ছিল দাদাভাই হুমায়ূন আহমেদের জন্য। আমরা তার সামনেই সব সময় বলি, দাদাভাইয়ের জন্য আম্মার আদরের ১০০ ভাগের ৯৫ এবং আর বাকি পাঁচ ভাইবোনের জন্য ৫। অর্থাৎ দাদাভাই = ৯৫% আমরা পাঁচজন = ৫%। অর্থাৎ ৯৫+৫ = ১০০। এসব কতবার আম্মা শুনেছেন, কিছু বলতেন না। মুচকি হেসে মেনে নিতেন।

একবার আম্মার গালের বাম দিকে একটা ফোড়ার মতো হয়েছিল। দিনে দিনে সেটা আবার শক্ত এবং বড় হয়ে যাচ্ছিল। যেহেতু ব্যথা নেই, সেহেতু আম্মারও কোনো অভিযোগ ছিল না। কিন্তু ভাইয়া (মুহম্মদ জাফর ইকবাল) ডাক্তার দেখানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে গেল। ডাক্তার তাকে বলেছে, আম্মার খুব তাড়াতাড়ি অপারেশন করতে হবে। নইলে ধীরে ধীরে ক্যানসারের দিকে টার্ন নেবে।

এক ডাক্তার (কোনো এক ব্রিগেডিয়ার) অপারেশন করলেন রাতে। ছয় ঘণ্টা পর জ্ঞান এল মনে হয়। আমরা পাঁচ ভাইবোন ঘুর ঘুর করছি। কতক্ষণ পরপর একজন করে ঢুকি। দাদাভাই তখনো এসে পৌঁছায়নি। সে তখন নুহাশপল্লীতে। ঢাকা এসে পৌঁছে যাবে সকালের মধ্যে। এদিকে একবার আমি ভেতরে ঢুকি আম্মার মাথায় হাত দিয়ে বলি, 'আম্মা, এই যে আমি শিখু।' আম্মা নির্বিকার। ওদিকে ডাক্তার বলেন, উনি চিনতে পেরেছেন। ঠিক আছেন। ভয় পেয়েন না। ভাইয়া ঢুকে বলে, আম্মা, আমি ইকবাল। আম্মার কোনো পরিবর্তন নেই। আপা শাহীন মনি—সবার বেলায় ডাক্তার বলছেন উনি সব বুঝতে পারছেন, সুস্থ আছেন। কথা বলতে হয়তো ইচ্ছা করছে না।

শেষে সকাল আটটার দিকে দাদাভাই (সঙ্গে গানম্যান) নুহাশকে নিয়ে এল। আমি তাদের নিয়ে আইসিইউতে ঢুকলাম। নার্সরা গানম্যানকে ঢুকতে দিতে চাচ্ছিল না বলে লোকটি জোর করে ঢুকল! ঢুকে আমি আম্মাকে বললাম, 'আম্মা, এই যে দাদাভাই এসেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে আম্মা তাঁর কাটা ফুলে থাকা গাল উপেক্ষা করে দুই হাতে চোখ মেলে বলতে শুরু করলেন, 'কই, হুমায়ূন কই? বাবা, শরীর ভালো?'

হাতে স্যালাইনের সুঁই ফোটানো, গালের ব্যান্ডেজ—এসব কিছুই না। ছেলে এসেছে। হুমায়ূন এসেছে। সেটাই আসল।

ছয় ভাইবোন : বাঁ থেকে মমতাজ শহীদ (শিখু), আহসান হাবীব, হুমায়ূন আহমেদ, শেফু, মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও মনি

আন্দাজ

একবার আমার সবচেয়ে ছোট বোনের মেয়ে তিথি খুব অসুস্থ হয়ে যায়। ওকে নিয়ে শিশু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সঙ্গে আমরা আম্মাসহ সব ভাইবোন। বাদ শুধু দাদাভাই হুমায়ূন আহমেদ, কারণ ওর সবচেয়ে অপছন্দের জায়গা হলো হাসপাতাল।

যাক, তিথির অবস্থা মোটামুটি ভালো হয়ে উঠতে লাগল, কিন্তু পাশের ছোট্ট বাচ্চাটির পেট ফুলে আছে। ওর নাকি পেশাব হচ্ছে না। কদিন থেকে সে কিছু খাচ্ছেও না। ৩-৪ বছর বয়স। অবস্থা দেখে মনে হলো, ওরা খুব একটা সচ্ছল না। ডাক্তার দেখে সব চেক করে দেখল, বাচ্চাটির কিডনি কাজ করছে না। ডায়ালাইসিস করতে হবে। ওদের ডায়ালাইসিস করার খরচ দেওয়ার মতো অবস্থা নেই। অবস্থা দেখে আম্মা আমাকে বললেন, 'তুই হুমায়ূনের বাসায় গিয়ে ওকে বল হাসপাতালে আসতে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আম্মা ও তো হাসপাতালে আসে না।'

আম্মা বলল, 'তুই তাড়াতাড়ি যা। টাকার কথা উঠলে ২০ হাজার দিতে বলবি।'

দাদাভাইয়ের ওখানে গিয়ে দেখি সে মাটিতে বসে তার সেই নিচু টেবিলের ওপর রাখা কাগজে লিখছে।

আমি বললাম, 'দাদাভাই, তোমাকে আম্মা হাসপাতালে যেতে বলেছে, তিথির শরীর খারাপ।'

সে বলল, 'আসল ঘটনা কী? কত টাকা লাগবে?'

খুলে বললাম সবকিছু। সে সাথে সাথে ড্রয়ার টান দিয়ে দুইটা দশ হাজার টাকার বান্ডিল দিয়ে দিল।

আমি টাকা ব্যাগে ঢোকালাম। ও বলল, 'রিকশায় যাবি না। মাইক্রোবাস খালি আছে, ওটা নিয়ে তাড়াতাড়ি যা।'

আমি হাসপাতালে চলে গেলাম টাকা নিয়ে। সবাই অভিভূত। এত তাড়াতাড়ি একজনের কষ্ট অন্যজন বোঝে?

ভাড়ার টাকা

আমরা তখন মোহাম্মদপুরের বাবর রোডে থাকি। দাদাভাই মাত্র বিয়ে করেছে। গুলতেকিন ভাবি পড়ে ইন্টারমিডিয়েটে। হলিক্রস কলেজে। বোধহয় ১৯৭৫ সাল।

সরকার আম্মাকে আব্বা শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদের সম্মানে একটি বাড়ি দিয়েছে। ১৯/৭ বাবর রোড। ভাবি বাবর রোড থেকে ফার্মগেটে তার কলেজে যেতে প্রতিদিন আম্মার কাছ থেকে রিকশাভাড়া নিয়ে নিয়ে।

একদিন ভাবি কলেজ থেকে ফেরার আগেই দাদাভাই বাসায় চলে এসেছে। সম্ভবত ক্লাস ছিল না। কিছুক্ষণ পর ভাবি এলে ভাত খেতে বসল। টেবিলে আমিও আছি। দাদাভাই ভাবিকে বলল, 'গুলতেকিন, তুমি খারাপ খবরটা শুনেছ তো?'

ভাবি অবাক হয়ে বলল, 'না তো, শিখু আপা তো আমাকে কিছু বলেনি। কী হয়েছে?'

দাদাভাই বলল, 'আম্মাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।'

ভাবি বলল, 'আল্লাহ, আমার কালকের রিকশাভাড়া কে দেবে?'

দাদাভাই বলল, 'তুমি এমন কথা কী করে বললে? আম্মা জেলখানায়, হাজতে কেমন আছে-না আছে—ওসব না ভেবে তুমি ভাবছ তোমার রিকশাভাড়ার কথা? শিগগিরই রেডি হও, শাড়ি পরো, চলো সেন্ট্রাল জেলখানায় দেখা করে আসি।'

ভাবি তাড়াতাড়ি শাড়ি পরল। দুজনে রওনা দিল রিকশা নিয়ে। কিছুদূর যাবার পর দাদাভাই বলল, 'সময় তো শেষ হয়ে গেছে। ছয়টার পর আর দেখা করতে দেবে না। আসো, দুজনে ফান্টা খাই।'

দোকানে গিয়ে ফান্টা খেল দুজনে মিলে। পরে আস্তে আস্তে বাসায় এল। আম্মা তখন বাসায় বসে আছেন। তাঁকে দেখে ভাবি চেঁচিয়ে উঠল, 'আম্মা, দেখেছেন আপনার ছেলের কাণ্ড! সে বলল, আপনাকে নাকি অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। এরপর আবার বকাও দিল ভুল করে আমি ভাড়ার কথা বলে ফেলেছিলাম বলে।'

আম্মা আসলে বাড়ির ব্যাপারেই দেখা করতে গিয়েছিলেন একজনের বাসায়।

অসুখ

দাদাভাই হুমায়ূন আহমেদ কখনো অসুখ সহ্য করতে পারত না। আমি তখনো খুব ছোট। স্কুলে ভর্তি হই নাই।

একদিন বাসায় এসে দেখি, দাদাভাই আমাদের কালো খাটটার ওপাশ থেকে গড়াতে গড়াতে এপাশে আসছে। আবার ঠিক তার পর পরই গড়াতে গড়াতে ওপাশে চলে যাচ্ছে। আমি আম্মাকে গিয়ে বললাম, 'দাদাভাইয়ের কী হয়েছে, আম্মা?'

আম্মা জবাব দিলেন, 'চুপ, স্কুল থেকে ওকে কলেরার ইনজেকশন দিয়েছে।

AMARBOI.COM

বাসের ছাদে চড়ে নেত্রকোনা যাচ্ছেন হুমায়ূন আহমেদ ও মুহম্মদ জাফর ইকবাল

AMARBOI.COM

তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে

হুমায়ূন আহমেদ

ভারতের বিখ্যাত কার্টুনিস্ট চণ্ডী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে দুটি কার্টুন করেছিলেন। একটিতে দেখা যাচ্ছে হাওয়াই শার্টের দোকান। পেছনে রবীন্দ্রনাথের ছবি। ছবির নিচে লেখা, 'আমাদের হাফ হাওয়াই শার্ট রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত।' দ্বিতীয় কার্টুনটিতে খালি গায়ে নেংটিপরা এক লোক মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, 'আমি তখন শান্তিনিকেতনের মাঠে গরু চড়াতাম। একদিন কবিগুরু ডেকে বললেন...'

সার্ধশততম জন্মবার্ষিকীতে বাংলাদেশ মনে হয় কার্টুনের দিকে চলে যাচ্ছে। অনেকগুলো পত্রিকা রবীন্দ্র-ফ্যাশন পাতা বের করেছে। একজন মডেলের ছবি দেখে ভালো লাগল। তিনি বুক-খোলা পাঞ্জাবি পরেছেন। তার বক্ষের কালো লোম পাঞ্জাবির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

ফ্যাশন ডিজাইনাররাও রবীন্দ্র-ফ্যাশনের টিপস দিয়ে লেখা লিখছেন। একটি লেখায় পড়লাম, নামী এক বিউটিশিয়ান মেয়েদের উদ্দেশে বলছেন, চোখে আইশ্যাডো দেওয়া যাবে, তবে কপালে টিপ থাকতে হবে। কিছু মডেলকন্যা রবীন্দ্র-ফ্যাশনে শাড়ি-ব্লাউজ পরে ফটোসেশন করেছেন। তাদের ব্লাউজের হাতা কনুই পর্যন্ত, তবে পেছনের কাট...থাক এসব কথা, কে জানে কবিগুরু হয়তো মেয়েদের পিঠখোলা ব্লাউজ পছন্দ করতেন।

আমার জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনবার বিভীষিকার মতো এসেছিলেন। এই তিনবেলার গল্প করা যেতে পারে। শৈশবের কথা। বাবা আমাদের তিন ভাইবোনকে তিনটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা বের করে দিয়ে বললেন, কবিতা মুখস্থ করতে হবে। আমার ভাগে পড়ল বিশাল কবিতা—'এবার ফেরাও মোরে'। ১২৭ লাইনের দীর্ঘ কবিতা। কিছুতেই মুখস্থ হয় না। বাবা কিছুদিন পর পর পরীক্ষা নেন। আমি আটকে অনেক ব্যথা করছে মনে হয়।'

বিয়ের আগের কথা, দাদাভাই তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির লেকচারার। আমার মনে আছে, শরীর খারাপ করলেই সে ড্রয়িংরুমের মাদুরে শুয়ে চিৎকার শুরু করে দিত, 'ও আম্মা, আপনি কই, আমি আর বাঁচব না, কাছে আসেন।' বলতেন, 'এই শিখু, তোর শক্ত হাতগুলো নিয়ে আয়, মাথাটা টিপে দে। শেফু কই? আধা কাপ চা বানায়ে আন। শাহীন কই?'

আম্মা যখন আড়ালে চলে যেতেন, দাদাভাই তখন আমাদের ছোট ভাইকে ডেকে বলতেন, 'শাহীন যা তো, দুইটা ৫৫৫ সিগারেট নিয়ে আয়। আর মণি কই? আমার পায়ের ওপর হাঁটতে বল ওকে।' সবচেয়ে ছোট বোন মণি তখন খুব খুব ছোট আর রোগা। ভাইয়া (মুহম্মদ জাফর ইকবাল) তখন থাকত হলে। না থাকলে তারও ঠিক কোনো ডিউটি পড়ত।

আমরা ঘরের সবাই মিলে দাদাভাইয়ের সেবা করছি। শাহীন গোপনে দুটি সিগারেট এনে দাদাভাইকে দিল। দাদাভাই তখন ডাকতে শুরু করল, 'রাজ্জাক কই? রাজ্জাককে বল আসতে।' আমাদের কাজের ছেলে রাজ্জাক ম্যাচ নিয়ে আসল গোপনে।

দাদাভাই তক্ষুনি গরম চা আর সিগারেট নিয়ে *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র*-এর একটা খণ্ড বের করে পড়তে বসে গেল। কই গেল তাঁর জ্বর, কই মাথাব্যথা।

আমার এখনো মনে আছে, সেই *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র*, ড্রয়িংরুমে 'কী চমৎকার একটা সারি!

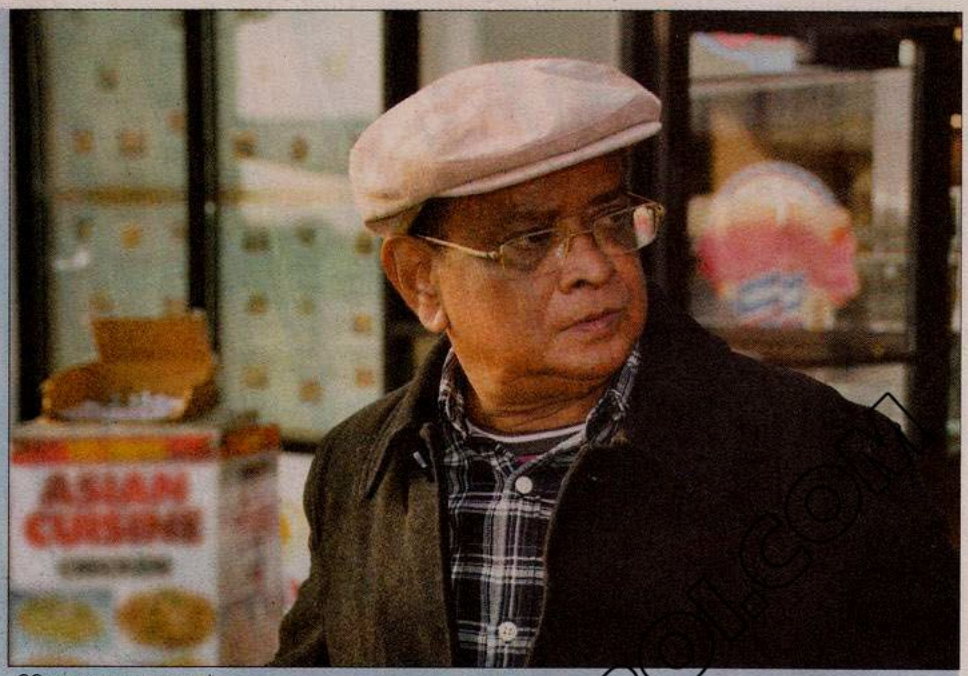

চিকিৎসা করাতে যখন যুক্তরাষ্ট্রে

গেলেই কঠিন চোখে তাকান। আমার বুকের রক্ত পানি হয়ে যায়। হায়রে রবীন্দ্রনাথ!

দ্বিতীয়বারের কথা বলি। এরশাদ সাহেব রাষ্ট্রীয়ভাবে শিলাইদহে রবীন্দ্র-উৎসব করবেন। আমার মতো অভাজন সেখানে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প নিয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ পেলাম। কারণ, সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ লেখকেরা এরশাদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে যেতে রাজি ছিলেন না। ছোটগল্পের অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করবেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান।

যেদিন অনুষ্ঠান সেদিন ভোরবেলায় আমাকে জানানো হলো, সৈয়দ আলী আহসান সভাপতিত্ব করলে বিতর্কের সম্ভাবনা দেখা দেবে মনে করা হচ্ছে। উনি শিলাইদহে আসা বাতিল করেছেন। আপনাকে সভাপতিত্ব করতে হবে।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এক আকাশ না, সপ্ত আকাশ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী থেকে জ্ঞানীগুণী অধ্যাপকেরা এসেছেন, তাঁরা প্রবন্ধ পড়বেন। সেই আসরে আমি সভাপতি! অনেক দেনদরবার করেও রক্ষা পেলাম না। মনে মনে কয়েকবার 'হায়রে রবীন্দ্রনাথ' বলে সভাপতির আসনে বসলাম। বুক ধকধক করছে, কান দিয়ে গরম বাতাস বের হচ্ছে। কে কী বলছে, কিছুই কানে ঢুকছে না। শুধু লক্ষ করছি, পশ্চিমবঙ্গের অধ্যাপকশ্রেণী মঞ্চে উঠেই অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বক্তৃতা শুরু করেছেন। এই প্রথম কোনো অনুষ্ঠানের সভাপতি হওয়া। এই শেষ। আমি বাকি জীবনে সভাপতি হইনি। আবার যে হব, সেই সম্ভাবনা শূন্যেরও নিচে।

তৃতীয় বিভীষিকার কথা বলি। বগুড়া ইয়ুথ ক্যায়ারকে দিয়ে আমি একটি রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করালাম। যিনি গান করলেন তাঁর নাম টিপু। বিখ্যাত গান, 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' সুর অবিকৃত রেখে গানটি করা হলো বগুড়ার আঞ্চলিক ভাষায়। আমার যুক্তি হলো, রবীন্দ্রনাথের গান যদি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় গীত হতে পারে, তাহলে আঞ্চলিক ভাষায় কেন গীত হতে পারবে না!

গান প্রচারের আগেই ঘটনা রবীন্দ্রপ্রেমীদের কাছে চলে গেল। কেউ কেউ গানের কপিও পেয়ে গেলেন। তাঁরা আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুললেন। বাংলাদেশ টিভির প্রযোজক মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবের ঘরে এক রবীন্দ্রভক্ত (বিখ্যাত ব্যক্তি বলেই নাম গোপন করছি) কঠিন গলায় বললেন, যে দেশে রবীন্দ্রনাথের চর্চা হয়, সে দেশে আপনার মতো মানুষের থাকা উচিত না।

তার পরও এই দেশে আনন্দের সঙ্গে বাস করছি, কারণ রবীন্দ্রনাথ আমাকে ডেকেছেন ছুটির নিমন্ত্রণে। আমার ছুটি আমার আনন্দের সবটা জুড়েই রবীন্দ্রনাথ। আমি কতই না ভাগ্যবান!